ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 937-943
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.087

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা: কবির চোখে কবি

সৌরভ মজুমদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Lyric poems are reflections of a poet's thought and the reader of the poem should have an understanding of poet's internal realisation of his time and his own self. Nirendranath Chakraborty, an eminent Bengali poet, started writing in the forties, before India got independence. His the then poems consisted of his thoughts and values for Indian struggle for independence, and the poems afterwards reflected some of the riots of Fifties and Sixties. With these in the background, Chakraborty's poems should have some understandings of the efforts and follies of the petty bourgeoisie class – as he was one of them. It should also contain his own misgivings and errors as a responsible human being. This article tries to understand those standpoints of the poets through discussing some of his poems.

***Keywords**: Nirendranath Chakraborty, Poem, Middle class, Intellectuals, self-reflection*

একজন কবির জন্য আত্মসচেতন ও সময়সচেতন হওয়া প্রয়োজন কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কবিদের রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করার নিদান দিয়েছিলেন তার কারণ শুধু এইমাত্র নয় যে, কবিরা অনুকরণের অনুকরণ করেন অর্থাৎ সত্যের থেকে তিনধাপ দূরত্বে থাকেন—সে নির্বাসনের কারণ এটিও যে, কবিরা তাঁদের কাব্যে যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটান, তা অনেকক্ষেত্রেই তথাকথিত 'রাষ্ট্রবিধান'-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না এবং পাঠক তথা উপভোক্তার মনে রাষ্ট্রবিরোধী ধ্যানধারণার জন্ম দিতে পারে। এছাড়া, তাঁরা তাঁদের কাব্যে দেবতাদের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করেন—যা দেবতাদের প্রতি নাগরিকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে বিনষ্ট করতে পারে। স্পষ্টতই, প্লেটো স্বীকার করেছেন কবিদের জনমতকে প্রভাবিত করার বিপুল ক্ষমতাকে। কবিতাকে কবি যদি ব্যবহার করেন দর্পণের মতো—যেখানে প্রতিবিম্বিত হবে সমাজমানসে ও সামাজিক ব্যবহারে নিহিত নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা, অমানবিকতা ও আদর্শচ্যুতির ক্ষেত্রগুলি, তবে তা হয়তো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কবি কি নিজে সমাজের থেকে, 'জনসাধারণ'-এর থেকে পৃথক কোনো সত্তা? হতে পারেন তিনি 'দ্রষ্টা', কিন্তু বাস্তব জীবনে কি তাঁকেও রাষ্ট্র ও সমাজের নির্ধারিত সীমার মধ্যেই অবস্থান করতে হয় না? জনতার অথবা শাসকের দোষত্রুটির অংশীদার কি তিনিও নন? নিজের বিচ্যুতির ক্ষেত্রগুলি যদি চিহ্নিত করতে পারেন তিনি, তবেই তো তার থেকে মুক্তির উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হবে! আত্মসচেতনতা ও সময়সচেতনতায় সুগঠিত ও জনমানসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন এই কবিতাকে প্লেটোর মতো রাষ্ট্রনীতিকেরা চিরকালই ভয় পেয়েছেন—তাই তাঁদের প্রচেষ্টা থেকেছে কবি ও কবিতাকে বস্তুপৃথিবীর সংসর্গরহিত করে গগনচারী সত্তার কণ্ঠনিঃসৃত স্বর্গীয় সংগীতে পর্যবসিত করার। 'বিশুদ্ধ কল্পনা'-র উপজাত বস্তু হিসেবে কবিতার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যহীনতাকে সোচ্চারে উপস্থাপন করেছেন তাঁরা। বাংলা লিরিক কবিতার বিবর্তনরেখা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বিহারীলাল

থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কবিতা মূলত এই প্রকল্পেরই ফসল। জীবনানন্দের ভাবনায় প্রথম কবিতার বায়বীয় ধূম্রাবয়বের মধ্যে অস্থি-মাংসের স্পষ্টতা চিহ্নিত হয়, তিনি জানান: "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।"[১] বিশ শতকের চারের দশকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় কবিতার বিষয়বস্তুতে উক্ত মতাদর্শের অনুরণন পরিলক্ষিত হয় এবং তার আঙ্গিকে সারল্যের মাত্রা বর্ধিত হয় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকতর বোধগম্যতার প্রয়াসে। কিন্তু সমর সেন বিশুদ্ধতাবাদী ও বিশেষ-আদর্শের-ধ্বজাবাহী দুইপ্রকার কবিতাকেই প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ বাঙালি কবি মুখ্যত 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত-শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় তার প্রলেতারিয়েত জনতার যাপন ও মানস সম্পর্কে অজ্ঞতা কবিতাকে প্রকৃতই শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলার পরিবর্তে আবেগসর্বস্ব ও নীরক্ত করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে, যে মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন কবি নিজে, যারা দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও প্রাকৃতজন-বিচ্ছিন্ন হওয়ায় একান্ত নিঃসঙ্গ—তাদের যাপনে নিহিত একেঘেয়েমি, ভয়াবহতা, গ্লানি ও বহুমুখী ব্যর্থতাকে কবিতায় তুলে আনার পক্ষে সওয়াল করেন সমর সেন, কারণ—

> রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ। অন্যদিকে সাংসারিক সচেতনতা আধুনিক বাঙালি কবিদের সাহায্য করতে পারে, কারণ সচেতনতা, এমনকী নিজেদের সামাজিক ব্যর্থতার সচেতনতাও, ক্ষমতা ও সংযম আনে। কালক্রমে যখন তাঁদের বিষয়বস্তুতে আসন্ন পরিবর্তনের ভাঙন ধরবে তখন অন্তত তাদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরবর্তী যুগের কবি এবং পাঠকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন।[২]

সমসাময়িক কাব্যভাবনার এই পটভূমিকায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কীভাবে তাঁর কবিতায় নিজশ্রেণি ও নিজেকে উপস্থাপন করেছেন তার আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দিষ্ট।

নীরেন্দ্রনাথ বিশ শতকের চারের দশকের সূচনাপর্ব থেকে আধুনিক বাংলা কবিতাচর্চার স্রোতোধারাটির অংশভাক্। একদিকে ভারতে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের তীব্র উত্তেজনা, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রশক্তির উত্তুঙ্গ রণরোলের বিপক্ষে মার্কসবাদী-চেতনায় উদ্দীপ্ত তরুণদলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান এইসময়ের কাব্যপ্রযত্নের পশ্চাদ্‌পটটি নির্মাণ করেছে, যার অনুরণন শোনা গেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতাতেও।

> আবার আকাশ লাল, শোণিতের প্রগাঢ় শপথ;
> নিস্তব্ধ সুপ্তির রাত্রে ক্ষুধার্ত হাওয়ার হাহাকার;
> দুরন্ত প্রাণের বন্যা প্রতিরোধ ভেঙেছে আবার।
> শতাব্দী-পুঞ্জিত লজ্জা, কলঙ্কলাঞ্ছিত দাসখত
> অসহ্য বেদনা হানে, উন্মুক্ত প্রতিজ্ঞা শোনো তার।
>
> ... ...
>
> ক্ষুধার্ত বিদীর্ণ প্রাণে প্লাবনের মহান আস্বাদ,
> গলিত বর্বর গর্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে নিমিখে।
> স্তম্ভ ভাঙে সাম্রাজ্যবাদের,
> বঞ্চিত বলিষ্ঠ বাহু মৃত্যুর সংকল্প নেয় লিখে
> ('বিয়াল্লিশের পর'/ অগ্রন্থিত কবিতা)[৩]

কিংবা "এখনও অবশ আলো ভেসে আসে বাঁকা চাঁদের,/ দুশো বছরের লাঞ্ছনা আর মায়া-ফাঁদের/ নেশায় ঘুমায় বন্ধুরা, ঘুম ভাঙো তাদের"[৪]('শহিদ রামেশ্বর'/ঐ) ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুচ্ছে কবির মার্কসবাদ-মনস্ক সংগ্রামী 'মিছিল-মন'টির অবয়ব প্রকট হয়ে উঠেছে—যা সমসময়ের শ্লোগানধর্মী কাব্যধারাটিকে ঘনিষ্ঠভাবেই অনুসরণ করেছে। কিছু কবিতায় শোনা গেছে আত্মজাগরণের আহ্বান, যেমন—"হে কুমার, তুমি জীবনকে চলো জানতে।... / যারা হেরে যায়, যারা নিবে যায়,/ মলিন যারা, বিমর্ষ,/ রাজপথ থেকে ডেকেছে তোমায়/ চূড়ান্ত শেল হানতে।"[৫] ('কুমারকে'/ঐ), যেখানে সর্বহারার একনায়কত্বের জন্য আত্মসর্বস্বতাকে বিসর্জনের মার্কসীয় প্রকল্পের পরিকাঠামোটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত এই সময়পর্বের কবিতা থেকেই নীরেন্দ্রনাথ বারেবারেই উল্লেখ করেছেন তাঁর নিজশ্রেণির 'মায়াঘুমে' আচ্ছন্নতার কথা, তুলে ধরতে চেয়েছেন তাদের সংকীর্ণ, যত্নলালিত অন্ধ-যাপনের নিহিত অন্তঃসারশূন্যতাকে নিজের কাব্যকাঠামোতে। একটি উদাহরণ—

গভীর ঘুমের ঘোরে অচেতন আমরা সকলে।
বাতাসের তহবিল থেকে
মুমূর্ষুর শেষবার-ধার-করা জীবনের মতো
চেতনার আঁচলেতে শেষবার পাক খেয়ে-খেয়ে
ক্লেদাক্ত মূর্ছার মতো আমাদের স্নায়ুর অসাড়।[৬] ('যাত্রা'/ঐ)

মধ্যবিত্ত-শ্রেণির এই স্নায়বিক অসাড়তা নীরেন্দ্রনাথের পরবর্তী-পর্যায়ের কাব্যপ্রয়াসে আরও প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৩-এ রচিত পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটির শেষাংশে মার্কসবাদে সুগভীর প্রত্যয়-জাত যে সুনিশ্চিত উত্তরণের আশ্বাস পরিলক্ষিত হয়("বেনামী বন্দরে আজ শেষ হল বিভীষিকা-রাত।/ বন্ধু, তোমার হাতে রেখেছি আমার এই হাত"[৭], ঐ), স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে রচিত কবিতাগুলিতে সে নিশ্চয়তার অভাব, এমনকী অনুত্তরণের সংশয়-জাত নৈরাশ্য প্রবল হয়ে উঠেছে ক্রমশ। বস্তুত, খণ্ডিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির হতাশায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগান তুলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে বিভ্রান্ত ও নবলব্ধ স্বাধীনতায় প্রলুব্ধ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মার্কসবাদ থেকে তথা প্রত্যক্ষ শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—যার ফলশ্রুতি শ্রেণিগত ও মানসিক নিশ্চলতা। একদিকে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান প্রলোভন ও অন্যদিকে দেশীয় ঐতিহ্য-বিচ্যুতির ফলস্বরূপ এই অবক্ষয়ী শ্রেণিচেতনা ক্রমশ উত্তরণের আশ্বাস হারিয়ে আত্মনাভি-কণ্ডূয়নরত হয়ে পড়ে, যার নিদর্শন উঠে এসেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতায়।

পারিপার্শ্বিকের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে কবি দেখেছেন, তপ্ত সময়ের মরুঝড় মানবজমিন অনুর্বর করে তুলছে—প্রেম-প্রীতি-করুণার সজলতা লুপ্তপ্রায় আজ হৃদয়মৃত্তিকায়, নেই দুঃখময় জীবনে আলোকিত ভোর আনার কোনো উদ্যমও। প্রকৃত কাম্যবস্তুর পরিবর্তে ঝুটো বিশ্বাসের আঙরাখায় এরা ঢেকে রাখে চোখ—"এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো/ পোশাকে মুখ লুকিয়ে, দ্যাখো কত না সাবধানে/ আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা"[৮] ('ঢেউ'/ নীলনির্জন)। ঐতিহ্য আর মূল্যবোধে সুগঠিত জীবনের ভিত্তিনির্মাণের পরিবর্তে সামূহিক দায়হীনতা ও আরামপ্রিয়তায় নিজেকে ক্রমশ বিকিয়ে দিয়েছে মানুষ। রামপ্রসাদী গানের অনুষঙ্গে কবি বলে যান সেই অনুর্বরতার প্রতীকী বিবরণ—"যে-মাঠে সোনা ফলানো যায়, আগাছা জমে ওঠে সেখানে"[৯] (ঐ)। আসলে কবি অনুধাবন করেছেন, বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই পৃথিবীতে নির্বিকার ধ্বংস-সাধনে মানুষের যে দক্ষতা—সৃজনী-সংরাগে নেই ততোখানি প্রযত্ন। পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, অনুকম্পার অভাব মানুষকে নবনির্মাণে অক্ষম করে ফেলেছে, তৈরি করেছে কেবল মানবতাহীন ঊষর এক ক্রমক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার নিরালোক দিবসশর্বরী।

নিতান্ত বোতাম টিপে সহস্র যোজন দূরে কোনো
গৃহস্থের সচ্ছল সংসার
ধ্বংস করা যায়। যায় না কি?
যায় না নিরন্ন প্রতিবেশীর ক্ষুধায়
অন্ন দেওয়া, পিপাসার্ত মাঠে
জল দেওয়া, অন্ধকার ভয়ের আকাশে আলো দেওয়া।
যায় না, যায় না।
কেননা, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল দিতে হলে,
অন্ধকারে আলো দিতে হলে
আরও কিছু দিতে হয়।
প্রেম দিতে হয়।[১০]
('মানব-সংসারে'/ অন্ধকার বারান্দা)

তীব্রভাবে আত্মকেন্দ্রিক, ঐতিহ্যবিচ্যুত, সমাজ ও পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন এই যে যাপনের বিন্যাস—তার সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ঐক্যবদ্ধ, পারস্পরিক সহানুভূতিময় যাপনের কোনো মিল পান নি কবি। রক্তে মিশে থাকা পূর্বপুরুষের স্মৃতির কাছে আত্মসমর্পণেও কোনো আলো দেখতে পান না কবি, কারণ "আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা/ আপাতত কোনো-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে"[১১] ('মৌলিক নিষাদ'/ঐ)। সময়ের পর্দাজুড়ে কেউ যেন অন্ধকার ছিটিয়ে দিয়ে গেছে—বিচ্ছিন্নতার দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত আজ মানুষ। আর প্রাত্যহিকতার অন্তরতম কোষে পৌঁছে গেছে সেই কালিমা—"আমি ভিতরে বাহিরে/ যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে/ যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।"[১২] (ঐ) সময়ের সংজ্ঞা তাই আজ 'নিষ্ঠুর'।

পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, যাবতীয় আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।[১৩] (ঐ)

কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা বিশ্বাসের আধারে ধৃত উদ্‌বর্তনের আশা না থাকায় অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি তীব্র ভীতি সৃষ্টি হয় মানুষের মনে—যে ভীতি যাবতীয় জিজীবিষার মূলোচ্ছেদ করে। পঞ্চাশ ও ষাটের উত্তাল দিনগুলিতে একের পর এক আন্দোলনে—খাদ্য আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলন, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন আন্দোলনে নেমে আসা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও স্বাধীনতা-লাভের আপাত-উল্লাসকে বিপন্নতায় রূপান্তরিত করে। কিন্তু এই ভীতির বাতাবরণেও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের নিস্তরঙ্গ যাপনের খোলশ ছিঁড়ে বেরোতে পারে না। কবির কলমে ফুটে ওঠে মধ্যবিত্তের যাপনের অন্তঃকরণে নিহিত অকর্মণ্যতার রূপরেখা—

তবু কিছু শান্তি, এই দুর্দিনের মেঘের আড়ালে
সুবর্ণ-সূর্যের ছটা ঝিলিমিলি আশ্বাসে হঠাৎ
ভেসে ওঠে। মনে হয়, এই অন্ধ ভয়ে-ভরা রাত
সমস্ত দুঃস্বপ্ন নিয়ে মুছে যাবে।
... ...
অথচ এ শুধু আশা। বৈশাখের শুভ্র স্বপ্ন যত
প্রত্যহ রক্তাক্ত হবে জানি আমি, ভয়ত্রস্ত প্রাণে
আবার নামবে রাত্রি তা-ও জানি, সবুজ ময়দানে
ছিঁড়ে যাবে ঘাসের জাজিম, তীব্র বেদনার শীতে
হৃদয় হলুদ হবে।...
তবু এই মুহূর্তে অন্তত
স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্রসংগীতে।[১৪]
('সঙ্গী-সংগীত'/ নীলনির্জন)

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জানে সময়ের ভিতরকণিকায় নিহিত বিপর্যয়ের স্বরূপ, কিন্তু সে তার মোকাবিলার কোনো উদ্যোগ নেয় না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় কোনো প্রতিবাদে মুখর হয় না সে। কেবল চোখবুজে বিপদের প্রতি বিমুখ হয়ে সাময়িক আনন্দ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টাতেই তার দিনানুদৈনিকের কর্মপ্রয়াস সম্পন্ন হয়ে যায়।

কবি নিজেও এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি নিজেও অনুভব করেছেন ক্রমশ ঘিরে আসা অন্ধকারের নিদারুণ অস্তিত্বকে। কখনো নিজের চারপাশের বিযুক্তি ও অসংবেদনার কঠিন দেওয়াল বিচূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, আঘাত করেছেন নিষ্ফল প্রয়াসে—"চেনা আলোর বিন্দুগুলি/ হারিয়ে গেল হঠাৎ—/ এখন আমি অন্ধকারে, একা।/ যতই রাত্রি দীর্ণ করি দারুণ আর্তরবে,/ এই নীরন্ধ্র নিকষ কালোর কঠিন অবয়বে/ যতই করি আঘাত, মিলবে না আর,/ মিলবে না তার দেখা"[১৫] ('দেয়াল'/ অন্ধকার বারান্দা)। এই অন্ধকারের স্বরূপ অনুভব করেছেন

তিনি—বুঝেছেন, অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইছা লালন করলেও, এ তামসতা তাঁর, তথা তাঁদের শ্রেণিভুক্ত মানুষেরই চেতনাজাত—

যদিও আমারই রক্ত এই অন্ধকারের শরীরে
প্রবাহিত। যদিও আমার সহোদর
এই অন্ধকার।
এই তিক্ত আত্মসুখসর্বস্ব তরল অন্ধকার[১৬]
('অন্ধকার নয়'/ ঐ)

ক্রমশ কবি অনুভব করেন, প্রকৃত বাস্তবে তাঁর অবস্থান নয়, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি তাঁর চারপাশে গড়ে তুলেছেন আত্মকেন্দ্রিকতার চার-দেয়াল। সমাজবিশ্লিষ্ট হয়ে কবি বস্তুত হারাতে থাকেন তাঁর দৃষ্টিমানতা—"চারদিকে চার-দেয়াল, চোখের দৃষ্টি নিবে আসে,/ শিউরে উঠি অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে;"[১৭]('দেয়াল'/ঐ), প্রতিকারে ভেঙে ফেলতে চান 'মায়াবী কপাট', কিন্তু পালাতে পারেন না—"কোথায় পালাব? ধবল ছায়াছায়া ভয়/ নেমে আসে, আর ম্লান চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে মন"[১৮]('পূর্বরাগ'/ নীলনির্জন)। এ ভয় আসলে গভীরতায় অন্তর্ভুক্তির ভয়, কারণ কবির যাবতীয় অংশগ্রহণ সবই ভীষণ উপরিতলিক—"আমি তো রয়েছি নিজেকে নিয়েই মুগ্ধ, যাইনি/ কোনোখানে, আমি বাড়াইনি হাত"[১৯](ঐ)। অস্তিত্ববাদী ভাবুকের মতো তিনি কখনো দলবদ্ধতার অন্তর্গত 'সহস্রফণা উপরন্তু একইসঙ্গে এমন বিষাক্ত-মনোরম উল্লাসের'[২০]('আমার ভিতরে কোনো দল নেই'/ আজ সকালে) মূর্তি দেখে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে—

সভ্যতার ভিতরে যে খোঁজে
অন্য চরিতার্থতা, সে অন্য পথে যায়।
দলবদ্ধতার ঘটাপটা
দুই পায়ে মাড়িয়ে তাকে একবার নিজের মধ্যে উঁকি
দিয়ে কথা বলতে হয় নিজের ভাষায়,
একবার দাঁড়াতে হয় নিজস্ব ইচ্ছার মুখোমুখি।[২১] (ঐ)

আবার কখনো বা 'পুরনো বিশ্বাসগুলি ধুঁকে মরছে,/ পুরনো ঘরবাড়িগুলি মুহুর্মুহু ধসে পড়ছে"[২২] ('পাগলা ঘন্টি'/ পাগলা ঘন্টি) দেখে একত্র প্রয়াসে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের হাল ফেরানোর জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু নিজের ভিতরে আর খুঁজে পান না উদ্যম। দেখতে থাকেন কবিতা আর প্রত্যাশা থেকে নয়, তৈরি হচ্ছে 'প্রত্যাশার প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রুপ' থেকে। তাঁর আত্মবীক্ষণ প্রকাশিত এইভাবে—

এই-যে প্রথম সূর্যের সাড়া, উদাস দুপুর,
বিকেলের মধুমালঞ্চমায়া, রাত্রির থরোথরো শিহরন,
ছায়াছায়া ভয়, ঝরোঝরো-শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
বাতাসের ছড়ে টেনে-যাওয়া ম্লান কান্নার সুর,—
বলো, এ কি শুধু নিজেকে লুকিয়ে
শুধু চোখে দেখা দেখে যাব, আমি সকালের মন, দুপুরের মন,
রাত্রির মন খুঁজে দেখবো না? শুধু ফাঁকি দিয়ে
চোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে যাব সব?
তা হলে আমি কি
কেউ নই? আমি সকালের নই, দুপুরের নই,
রাত্রিরও নই? তা হলে, তা হলে
এই যে আকাশে প্রগাঢ় সূর্য সারাদিন জ্বলে,
এই-যে রাত্রে লক্ষ হিরার চোখ-ঝিকিমিকি—
আমি তো এদের চিনি না। তা হলে

আরও কত কাল এভাবে কলম ঠেলতে বলো,
আরও কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো?[২৩]

('পূর্বরাগ'/ নীলনির্জন)

বস্তুত, কবি নিজের দাঁড়াবার জায়গাটি খুঁজে নিতে চাইছেন—পেতে চাইছেন এমন কোনো স্থিরবিন্দু, যেখান থেকে তিনি নিজেকে ও নিজের কবিতাকে সমাজের পক্ষে উপযুক্ত করে তুলতে পারবেন। প্রকৃতি ও মানুষকে তাদের প্রকৃত বাস্তবতায় চিনে, বুঝে, প্রত্যক্ষতায় উপলব্ধি করে 'লেখা-লেখা খেলা'-র পরিবর্তে খাঁটি কবিতা লিখতে চাইছেন এখন কবি। তাই প্রশ্ন উঠছে—"কবিতার অর্থ কী? কবিতা/ বলতে কি এখনও আমি কল্পনালতার ছবি দেখে যাব?"[২৪]('কবিতা কল্পনালতা'/ নক্ষত্রজয়ের জন্য)। এক ধূমল কুয়াশার আড়ালে ব্যক্তিমানুষ পৃথক হয়ে আছে মনে ও মগজে—বাকিদের মতো কবিও 'অচিরে কুয়াশা কাটবে এই নাবালক প্রতীক্ষায়' থাকবেন না আর, বরং বুঝতে চাইবেন এই কুয়াশার স্বরূপ—"কবিতা মানে কি এই কুয়াশার ভিতরে একবার/ বাঘ সিংহ হায়েনা ইত্যাদি/ পশুর দাঁতের শক্তি বুঝে নেওয়া নয়?"[২৫](ঐ) আজ আর কবি 'সাময়িক সমস্ত দৌরাত্ম্য দেখা'-য় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন না, আজ তাঁকে নেমে পড়তেই হবে অ্যাম্ফিথিয়েটারের রিঙের ভিতরে, কেননা—

কল্পনালতার ফুল কুয়াশা কাটলেও কেউ দেখতে পাবে না
কেননা কুয়াশা আজ প্রত্যেকের মগজে ঢুকেছে। তাই
কবিতাকে ভালবেসে, ক্রমাগত ভালবেসে-বেসে
তোমাকে আমাকে আজ অন্তত একবার
ভিতরে-বাহিরে ব্যাপ্ত এই অন্তহীন কুয়াশায়
আলাপে-উৎসুক ধূর্ত বাঘের খাঁচার মধ্যে হেঁটে যেতে হবে।[২৬] (ঐ)

ভয়ের যে কাঁটাতার কবিকে আটকে রেখেছিল চার-দেয়ালের মধ্যে— আজ কবি নিজেই তার সম্মুখীন হয়েছেন, আর দেখেছেন, ভয়ের মূলে ছিল লোভ। তিনি জানেন, "কবি যদি লোভী হয়,/ তা হলে সে কবি নয়,/ তা হলে সে পথের কাঙাল।"[২৭]('কবি যদি'/ ভালোবাসা মন্দবাসা)। তাই সেই লোভকে—কবিখ্যাতির লোভকে, সামাজিক সম্মানলাভের লোভকে, ক্ষমতাসীন হওয়ার লোভকে যেই তিনি পদদলিত করে বলতে পেরেছেন—"কিছুই আমি চাই না,"[২৮]('জোড়া খুন'/ উলঙ্গ রাজা), তখনি ভয়ও তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে। হয়তো এইবার তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার বোধ অনুভব করতে পারবেন; 'নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকারে' বন্দী যে প্রৌঢ় পালোয়ানের 'হবি' ছিল 'দিবারাত্রি কবিতা লেখা', অথচ যে অন্ধকারে নিজের মুখ-দেখতে চেয়েও আয়নার সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে কবিতা-প্রসব করতো, যেখানে থাকতো নিজের প্রতিবিম্ব-দর্শনের চিরন্তন আকুতি—" 'অন্ধকারে কোথায় অশ্রুর/ ধারা বহে যায়।/ কে যেন নিজের মুখ চিরকাল দেখতে চেয়েছে/ নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকারে!' "[২৯]('নিয়ন -মণ্ডলে, অন্ধকারে'/ নীরক্ত করবী) — হয়তো কবি এবার সেই মিথ্যা বিশ্বাস (mauvaise foi)-এর ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়ে আয়নায় নিজের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাবেন।

তাই " 'আমি শুধু কবি, দোষ নেই কিছু আর' "[৩০] ('সিনা দ্য পোয়ট্'/ জলের জেলখানা থেকে) বলে পালিয়ে বেড়ানো কবিতালেখক-কে নীরেন্দ্রনাথ আর 'কবি' বলতেই রাজি নন—সে কেবল এক 'মিল মেলানো পদ্যকার', আর তার লেখাও নিতান্ত 'ফলাফলহীন'—"বন্যা, প্লাবন, দেশজোড়া আঁধিয়ার,/ কিছুতেই কিছু শেখা/ না তার লক্ষ্য, না তার অভিপ্রেত।/ তাই তাকে দাও ছেড়ে।"[৩১](ঐ) শুধু নিজের নয়, হয়তো কবিতারও প্রকৃত স্বরূপ এখন তাঁর কাছে ধরা দেবে। সে মূর্তি কিন্তু খুব সুশ্রী-সুমধুর নয়—কবিকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দিতে পারতো যে 'সুলক্ষণ' শব্দগুলি, তারা হয় এখন 'হাড্ডিসার, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফোঁকে'[৩২]('নক্ষত্রজয়ের জন্য'/ নক্ষত্রজয়ের জন্য), নইলে লোভের কঠিন আঙুলে আটকে পড়ে 'ইঁদুরের মতো কিচকিচ' করে। বস্তুত, কবি এখন 'শুধুই লোভের ধূর্ত মার্কামারা মুখ ভিন্ন অন্য-কোনো মুখ দেখতে'[৩৩](ঐ) পান না। তাই মেঘের মিনারে পা ঝুলিয়ে জ্যোৎস্নায় কুলকুচো করার মতো শব্দের সন্ধান না পেয়ে কবি এখন খোঁজেন 'বুলেটের মতো একটা শব্দ'— যেটার আঘাত ভেঙে দেবে আত্ম-অহংকারের নকল বুঁদির কেল্লা, আর কবি 'ফাটা কপালের রক্ত মুছে হেসে'[৩৪](ঐ) উঠবেন। অর্থাৎ কবিতা এখন আর গগনবিহারী হয়ে আপনাতে

আপনি মগ্ন থাকবে না—তা হয়ে উঠবে আয়নার বিকল্প, হয়ে উঠবে অস্ত্রের প্রতিস্পর্ধী, হয়ে উঠবে রক্ত-মাংসের মানুষের যাপনের এক অকৃত্রিম অংশ।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, জীবনানন্দ, উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, সমগ্র প্রবন্ধ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০১৮,পৃ. ৩৮
২. সেন, সমর, বাংলা কবিতা, সব্যসাচী দেব ও সোমেশ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংকলিত সমর সেন, কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৫৭, পৃ. ৬১
৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯,পৃ.২৬২
৪. ঐ, পৃ. ২৫৫
৫. ঐ, পৃ. ২৬০-৬১
৬. ঐ, পৃ. ২৪৪
৭. ঐ
৮. ঐ, পৃ. ১১
৯. ঐ
১০. ঐ, পৃ. ৭১
১১. ঐ, পৃ. ৯০
১২. ঐ
১৩. ঐ
১৪. ঐ, পৃ. ১৯
১৫. ঐ, পৃ. ৫১
১৬. ঐ, পৃ. ৯২
১৭. ঐ, পৃ. ৫১
১৮. ঐ, পৃ. ২১
১৯. ঐ
২০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৮,পৃ. ১৫৩
২১. ঐ
২২. ঐ, পৃ. ১৬০
২৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯,পৃ.২১
২৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৯০
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. ঐ, পৃ. ২২৮
২৮. ঐ, পৃ. ১২৫
২৯. ঐ, পৃ. ৮৫
৩০. ঐ, পৃ. ২১৩
৩১. ঐ, পৃ. ৯৬
৩২. ঐ
৩৩. ঐ
৩৪. ঐ